একজন কপোতী ঘাগড়া

কপোতীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। হতাশায় নেশাগ্রস্ত তরুণ ফিরে এসেছে স্বাভাবিক জীবনে

● **কেকা অধিকারী**

গারো তরুণী কপোতী ঘাগড়া এখন নলছাপড়া স্কুলের শিক্ষক। নলছাপড়া হলো নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম– গারো, হাজং আর বাঙালির হাজার বছরের বসতি। কপোতী প্রতিবছর তার স্কুলের ক্লাস নাইনে ওঠা ছেলেমেয়েদের কাছে নিজের জীবনের গল্প শোনাবার জন্যে মুখিয়ে থাকেন। কী জানি, তার গল্প হয়তো দরিদ্র, অসহায় কোনো ছাত্রছাত্রীকে বাধা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে আশার আলো দেখাবে! গ্রামেগঞ্জে আজ নারী শিক্ষকের অভাব নেই। বিএ, এমএ ডিগ্রিধারী নারীর সংখ্যাও ঢের। তবুও কারো কারো জীবনে এটুকু আসাই যেন হিমালয় জয়ের চেয়ে বেশি। সব শুনে মনে হলো কপোতীর কথা যে কোনো মানুষকে জীবন-যুদ্ধে হার না মানতে উৎসাহিত করবে বৈকি! সে কারণেই এ গল্পের অবতারণা।

১৯৯০ সালে বাবা আরেকটি বিয়ে করে তাদের ছেড়ে চলে গেলে কপোতীর জীবন পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায়। সে তখন বিরিশিরি গার্লস হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। থাকত সেখানে হোস্টেলে। বাড়ি তার বেশ দূরে নলছাপড়া গ্রামে। আগে থেকেই মায়ের মানসিক সমস্যা ছিল। বাবার অনুপস্থিতিতে সে সমস্যা প্রকট হলো, দরিদ্রতর হলো দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা। কী করে এই পরিবারটি চলবে, কেমন করে কপোতী ও তার ভাই পড়ালেখা চালিয়ে নেবে– এমন নানা প্রশ্নের মেঘ তাদের আকাশকে অন্ধকার করে রেখেছে। গারো সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা আছে বলে শুধু একটাই ভরসা নানা তাদের পাশে আছেন। ছোট্ট কপোতী হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার মুখে। মনে ভীষণ কষ্ট। সেই কষ্টকে শতগুণ বাড়িয়ে দিত আশপাশের অনেক মানুষের ব্যবহার। সেসব মানুষ তাকে 'পাগলের মেয়ে' বলে, 'বাবা ছেড়ে গেছে' বলে নানাভাবে হেয় করত। বাবার ওপর মনে তার গভীর অভিমান। বাবাকে দেখিয়ে দেয়ার প্রত্যয় অন্তরে। কী করে দেখাবে ছোট্ট মেয়ে কপোতী? 'আমি ভাবলাম ভালোভাবে পড়াশোনা করে বাবাকে দেখিয়ে দেব। সেই থেকে আমার ক্লাসে প্রথম হওয়া শুরু।' নানা এরই মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন নামের এনজিও'র কাছে দরখাস্ত লিখে কোনোমতে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তার পরীক্ষায় ভালো ফল সে সহায়তা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এভাবে কোনোক্রমে সে এসএসসি পাস করল।

এইচএসসি পড়া হবে কেমন করে? মাথার উপরে ছাতা ধরার মতো তো কেউ নেই। মামি পরামর্শ দিলেন নার্সিং পড়ার। কেননা তাতে কোনো খরচ লাগবে না। কিন্তু কপোতীর যে

উচ্চ শিক্ষা নেয়ার স্বপ্ন! আবার ওয়ার্ল্ড ভিশন, অন্যান্য সংস্থা আর আত্মীয় স্বজনের কাছে সহায়তার জন্য হাত পাতল সে। কারণ তাকে পড়া চালিয়ে যেতেই হবে। সবসুদ্ধ ছয় হাজার টাকা হাতে নিয়ে ময়মনসিংহে পাড়ি দিল কপোতী। কলেজে ভর্তি, বই খাতা কেনা, থাকা-খাওয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য টাকাটা যে সামান্য তা যে কেউই বুঝবে। কপোতী কলেজে ভর্তি হয়েই একটা থাকার জায়গা খুঁজে নিল। তারপর শুরু হলো নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যুদ্ধ। অপরিচিত শহরে কী করবে, আত্মীয়-পরিজন ছাড়া কোথায় যাবে বুঝতে পারছিল না। কাছেই ওয়ার্ল্ড ভিশন অফিস আছে শুনে সেখানে গেল সাহায্যের আশায়। তারা অর্থ সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ করলেও একটা আশার কথা শোনালো- 'দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের জন্য কোচিং ক্লাস খোলা হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক দরকার। ডিগ্রি পড়ছে এমন ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেয়া হবে। তারপরও তুমি অ্যাপ্লাই করে দেখতে পার।

'এইচএসসি'র ছাত্রী হয়েও মেধার গুণে কপোতী শর্তসাপেক্ষে চাকরিটি পেয়ে গেল। বেতন মাত্র ৭০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে তো তার পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচ চলবে না। সে বাড়তি আয়ের পথ খুঁজতে লাগল। অনেক খুঁজে তেইজে ব্রাদারদের একটি প্রজেক্টে আর একটি খণ্ডকালীন কাজ জুটিয়ে ফেলল কপোতী। এবার তার পড়া চালানোর একটা পথ হলো। এর মধ্যে একজন দয়ালু মানুষ তার শ্রম ও পড়াশোনার আকাঙ্ক্ষা দেখে তার কথা অস্ট্রেলিয়ার এক ভদ্রলোককে লিখে জানালেন। সেই বিদেশি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কপোতী তার কাছ থেকে মাসে দুই হাজার করে টাকা পেতে শুরু করল যা বিএ পরীক্ষা পর্যন্ত বহাল ছিল। কপোতী কিন্তু নিজেকে নিয়ে থাকেনি, যখনই তার একটু চলার অবস্থা হয়েছে তখন থেকে গ্রামে মা-ভাইকে সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন এনজিও'র দেয়া বিনামূল্যের প্রশিক্ষণগুলো সে পরম আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। 'এই ট্রেনিংগুলোর কারণে আমাকে কখনো বেকার থাকতে হয়নি।'

ডিগ্রি পড়ার সময় থেকেই বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছিল তার। অনেক ভালো ভালো পরিবার থেকে প্রস্তাব এলেও তার পরিবারের কথা শুনে সবাই পিছিয়ে গেছে। বিএ পাস করার পর 'যোগ্যতার মূল্যায়ন' করতে জানে এমন ভালো মনের ছেলে লিউস দাড়িংকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। নিজের শ্রম আর স্বামীর উৎসাহে কপোতী এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ এবং বিএড ডিগ্রিধারী। কপোতী এখন ক্লাস সিক্সে পড়া এক ছেলে ও ৩ বছরের এক মেয়ের মা। বাবাকে সে মাঝে মাঝে দেখতে যায়, সাধ্যানুসারে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, উৎসব-পার্বণে উপহার দেয়। শুনেছে তার লজ্জিত বাবা অন্যদের কাছে মেয়ের অনেক প্রশংসা করেন, তাদের ফেলে আসার জন্য আক্ষেপ ঝরে তার কণ্ঠে। স্কুল আর ঘর সামলে সমাজের নানা কাজের সঙ্গে জড়িত আজ কপোতী। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। হতাশায় নেশাগ্রস্ত তরুণ ফিরে এসেছে স্বাভাবিক জীবনে। যখনই স্থানীয় ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্র্যাক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাকে তাদের প্রোগ্রামে ডাকে কোনো সময়ই কপোতী তাদের ফিরিয়ে দেয় না। 'সমাজের বিভিন্ন মানুষ আর বিভিন্ন সংগঠন আমার জন্য যা করেছে আমি তা কখনই ভুলে যাই না। শুধু হাত পাতলেই হবে না, দিতেও জানতে হবে। দেয়া-নেয়া থাকলেই কাজটা হবে।' ■